Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 149-161

সিপাহি বিদ্রোহে প্রবাসী বাঙালি : প্রসঙ্গ প্রমথনাথ বিশীর 'চাপাটি ও পদ্ম'

গোপাল ঘোষ

বিশ শতকের একজন সফল আখ্যানকার প্রমথনাথ বিশী (১৯০১—১৯৮৫)। উপন্যাস, ছোটগল্প, সমালোচনা গ্রন্থ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ছোটগল্প রচনায় তিনি দেশ-কালের অতীত ইতিহাস ও ঘটনা প্রসঙ্গের সঙ্গে পাঠককে অভিনব ভঙ্গীতে পরিচয় করিয়ে দিতেন। উনিশ শতকের সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনাপ্রসঙ্গ ও তার অনুষঙ্গের কথা প্রমথনাথ বিশীর আখ্যান সৃষ্টিতে বারে বারে উঠে এসেছে। তবে অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের থেকে তিনি স্বতন্ত্র, বলা ভালো মৌলিক। কারণ সিপাহি বিদ্রোহ নিয়ে একটি সমগ্র গল্পগ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি, যার নাম 'চাপাটি ও পদ্ম' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ, প্রথম সংস্করণ)। গল্প গ্রন্থটিতে বারোটি গল্প আছে। তবে আমরা এই গল্প গ্রন্থটিতে 'প্রবাসী বাঙালি' সম্প্রদায়ের প্রতি আলোকপাত করবো। তাই নির্দিষ্টভাবে যে সকল গল্পে প্রবাসী বাঙালিদের উপস্থিতি বা ভূমিকা উঠে এসেছে কাহিনি প্রসঙ্গে, আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় সেই সকল গল্পগুলি।

এখন পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শুধুমাত্র বাঙালি কেন? এর উত্তরে বলতে হয়, দেশ স্বাধীনের পূর্বে কিংবা পরবর্তীতে বাঙালির ভূমিকা কিরূপ ছিল তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ বহুবার হয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকে ইংরেজের গা ঘেষা বাঙালির ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন বিদ্যমান ছিল। অভিযোগের তীর সরাসরি বাঙালির বীরত্ব গাথা নিয়ে। বস্তুত ব্রিটিশ অধীনস্ত ভারতবর্ষে আমলা শ্রেণির মধ্যে উৎকর্ষতায় বাঙালি শীর্ষস্থানীয় একথা যেমন সত্যি, অন্যদিকে দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে বাঙালি বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ সর্বজন স্বীকৃত। এত কিছুর পরেও বাঙালিকে শুনতে হয় —'"বাঙালী যোদ্ধা" একথা বলিলে, বিদেশীদের কথা দূরে থাকুক, বাঙালীদের মধ্যেও অনেকেই এখনও হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। ..... মোট কথা, আজকাল এটা এক রকম স্বতঃসিদ্ধের মতই হইয়া গিয়াছে যে বাঙালী 'যোদ্ধার জাতি' নয় অথবা বাঙালী জাতি হইতে যোদ্ধা তৈয়ারি করা একটা অস্বাভাবিক এবং দুষ্কর কাজ।'[১] উনিশ শতকের সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে বাঙালির প্রতিবাদী সত্ত্বা নিয়ে বড় প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দেয়। সেই

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন সাহিত্যিকরা তাঁদের নিজের মতো করে। যে তালিকায় প্রমথানাথ বিশী একজন সচেতন গল্পকার। সিপাহি বিদ্রোহ নিয়ে লেখা তাঁর লালকেল্লা (১৯৬৩) উপন্যাসকে কার্যত এক ঐতিহাসিক দলিল বলা চলে। তবে আমরা 'চাপাটি ও পদ্ম' নামক গল্পগ্রন্থ নিয়ে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। আমরা দেখেছি সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনা প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে লেখকের কৌতুহল আবর্তিত হয়েছে মূলত সাধারণ মানব জীবনের প্রতি। সাধারণ বলে যারা ইতিহাসের পাতায় উপেক্ষিত, লেখকের সহানুভূতিশীল কলম তাঁদের প্রতি সবচেয়ে মর্মস্পর্শী — 'সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিক ও রাজনীতিগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ব্যাপারটা নব্যযুগের প্রথম সিংহনাদ বা মধ্য যুগের অন্তিম আর্তনাদ এ নিয়ে ঐতিহাসিক ও রাজনীতিকগণ তর্ক করুন। শিল্পী এ বিষয়ে কোন পক্ষে মতপ্রকাশ করতে বাধ্য নয়। তার যদি কোনো সিদ্ধান্ত থাকে তবে ইতিহাস-জিজ্ঞাসুরূপে আছে, শিল্পের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অনিবার্য নয়। শিল্পীর চোখ দেখছে যে সিপাহী বিদ্রোহ (বা যুদ্ধ) উপলক্ষে হিন্দুস্থানে একটা বিরাট ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল আর তার ফলে তারই মধ্যে নিক্ষিপ্ত অগণিত নরনারী দুঃখ বেদনা আর্তিতে ক্ষণে ক্ষণে হাহাকার করে উঠেছে। এই হাহাকারটাই শিল্পীর বস্তু। রাজায় রাজায় চলছিল যুদ্ধ, উলুখড়ের বনে চলছিল বিপর্যয় — এই বিপর্যয়টাই শিল্পীর বস্তু। শিল্পীর দায়িত্ব ইতিহাস বা মতবাদের কাছে নয় — মানবজীবনের নানা রঙের ডোরাকাটা ওই ছবিখানার কাছে। শিল্পীর স্থান রাজ-রাজড়ার পক্ষে নয়, শিল্পীর স্থান আন্দোলিত, বিমর্দিত, বিপর্যস্ত উলুখড়ের পক্ষে। তার একমাত্র দায়িত্ব তাদের জীবন-কাহিনী অঙ্কন। তত্ত্ব নয়, মত নয়, চিত্র ও গল্প তার একমাত্র লক্ষ্য।'[২]

গল্প প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে উনিশ শতকের রাজনৈতিক সামাজিক পরিসরে বাঙালির অবস্থান নিয়ে দু-চার কথা বলতে পারি। বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজ দণ্ডতে রূপান্তরিত হয়েছিল প্রথম এই বাংলায়। পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭), দেওয়ানি লাভ (১৭৬৫) — এর পরবর্তী পর্যায়ে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে সমগ্র ভারত ভূখন্ড দখলের দিকে পা বাড়ায়। তবে ভারত দখলের কাজ গুটিকতক ইংরেজরাই করেনি। শাসন ক্ষমতার প্রসারে কোম্পানি শুরু থেকেই ভারতীয়দের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। তাই চলনে-বলনে, শিক্ষা-দীক্ষায়, ভাবনা-চিন্তায় ইংরেজ শাসক সমগোত্রীয় নেটিভ নির্মাণে সুখ, স্বাচ্ছন্দ, প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রলোভন দেখায় ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে। এই কর্মযোজ্ঞে বাঙালিরা ছিল সবচেয়ে এগিয়ে। মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন জমিদারদের উদ্ভব, মুৎসুদ্দী শ্রেণির আবির্ভাব — এসবেরেই মিলিত যোগফল হল 'ইঙ্গ-বঙ্গ' সমাজ। যার আবির্ভাব, শ্রীবৃদ্ধির

প্রেক্ষাপট সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে। এই দীর্ঘ সময়ে ব্রিটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ ছিল কার্যত নজর কাড়ার মতো। বাঙালিরা এই চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফার্স্ট বয়। সমস্ত প্রতিযোগিদের পিছনে ফেলে ইংরেজদের কাজের মানুষ, কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত বাঙালিরা। বাঙালি চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের পরিসর ক্রমশ ব্যপ্তি লাভ করেছে ব্রিটিশ শাসন ক্ষমতার হাত ধরে। বাঙালি বাংলার বাইরে প্রবাসী জীবনকালে চাকুরিবৃত্তি মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠে। প্রবাসী বাঙালির অধিকাংশই ছিল চাকুরিজীবী। ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনে সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছিল বাঙালি। বলাবাহুল্য ব্রিটিশদের এই সমাদর ও ভরসার যথাযোগ্য প্রতিদান দেয় চাকুরিজীবী 'ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ'। সিপাহি বিদ্রোহের উত্তাপময় পরিস্থিতিতে ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে পয়লা নম্বর বাঙালিদের কৃতিত্ব ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। শুধু ইতিহাস নয়, সাহিত্যের বৃহৎ পরিসরে সিপাহি বিদ্রোহের উত্তাপময় দিনগুলির বিনির্মাণে ব্রিটিশ শাসন, সিপাহিদের বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থান উঠে এসেছে। সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী 'চাপাটি ও পদ্ম' গ্রন্থের 'সেই শিশুটি' এবং 'ছিন্ন-দলিল' গল্পে সিপাহি বিদ্রোহের ক্রান্তিলগ্নে বাঙালি চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের মননকথা তুলে ধরেছেন। তাঁদের অবস্থান, সংকট, উত্তরণের জীবনগাথা প্রমথনাথ বিশীর কলমে ফুটে উঠেছে অভিনব ভঙ্গিতে। আমরা সেই নির্মাণের দিকে আলোকপাত করব ক্রমপর্যায়ে।

দুই.

উনিশ শতকে সিপাহি বিদ্রোহের উত্তাপময় পরিবেশ পরিস্থিতির ভয়াবহতা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সীমাকে অতিক্রম করে সাহিত্যের উন্মুক্ত মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে। প্রমথনাথ বিশী সিপাহি বিদ্রোহের বিবিধ ঘটনা সমূহকে তাঁর লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। গল্প লেখক প্রমথনাথ বিশী রাজ্যসভার সদস্য থাকায় সিপাহি বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল উত্তর ও মধ্যভারতে প্রচলিত বিদ্রোহ সংক্রান্ত বহু কিংবদন্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বস্তুত কিংবদন্তিগুলিকে সুকৌশলে গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে। আলোচ্য 'সেই শিশুটি' গল্পের উৎস সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন— 'রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের গোরার জন্মবৃত্তান্ত আছে — তাহাই উপজীব্য। পরিবেশ কাল্পনিক নয়।'[৩] আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় গল্প এবং গল্পে বর্ণিত পরিবেশ পরিস্থিতি তথা তৎকালীন দেশ, দশ, সমাজ। গল্পের প্রধান চরিত্র বাঙালি কৃষ্ণদয়াল মুখুজ্জে এবং তার স্ত্রী আনন্দময়ী। কৃষ্ণদয়াল কর্মসূত্রে এটোয়া

শহরের কমিশারিয়েট দপ্তরের দেশীয় চাকুরিদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকারী। কৃষ্ণদয়াল মুখুজ্জে নিজগুণে সামান্য কেরানি থেকে হেড ক্লার্ক পদে আসীন —'প্রথম প্রবেশের সময়ে তিনি কনিষ্ঠ কেরানীর দলে ছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই নানা উপায়ে, যাহার কিছু কিছু নিজ মুখেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, কৃষ্ণদয়ালবাবু কমিশারিয়েট দপ্তরের দেশীয় চাকুরেদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।'[৪] প্রবাসী বাঙালি চাকুরিজীবী কৃষ্ণদয়াল বাবুর গুণগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হতে বেশি সময় লাগেনি। শ্রেণি সচেতন কৃষ্ণদয়াল নিজ কর্মক্ষেত্রে উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে ইংরেজ শাসকের পছন্দ অপছন্দের বিষয়গুলি সচেতনভাবে আত্মস্থ করেছেন একথা বলায় বাহুল্য। তাই সহকর্মী পরেশ যেখানে 'জুনিয়র গ্রেডে ঘষড়াচ্ছে'[৫], সেখানে কৃষ্ণদয়াল শীর্ষ স্থানাধিকারী। আমরা এই উন্নতির সূত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে এক নজরে কৃষ্ণদয়ালের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে চোখ বুলিয়ে নিতে পারি : 'ইহার প্রথম স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিয়া যখন মারা যান তখন ইহার বয়স তেইশ বছর। মাতার মৃত্যুর কারণ বলিয়া রাগ করিয়া ছেলেটিকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া কৃষ্ণদয়াল প্রবল বৈরাগ্যের ঝোঁকে একবার পশ্চিমে চলিয়া যান এবং ছয় মাসের মধ্যেই কাশীবাসী সার্বভৌম মহালয়ের পিতৃহীনা পৌত্রী আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। পশ্চিমে কৃষ্ণদয়াল চাকরির জোগাড় করিলেন এবং মনিবদের কাছে নানা উপায়ে প্রতিপত্তি করিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে সার্বভৌমের মৃত্যু হইল, অন্য কোন অভিভাবক না থাকাতে স্ত্রীকে নিজের কাছে আনিয়াই রাখিতে হইল। ইতিমধ্যে যখন সিপাহীদের মিউটিনি বাধিল—''[৬]

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে এটুকু স্পষ্ট, কৃষ্ণদয়ালের ব্যক্তিজীবনে কিছু সাময়িক বিঘ্ন দেখা দিয়েছিল, তবে সেই বিঘ্ন অতিক্রম করে কৃষ্ণদয়াল এখন কোম্পানির চাকুরে। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণদয়াল চাকুরে মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে উদগ্রীব। স্ত্রী আনন্দময়ীকেও চাকুরে মনোবৃত্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করতে সে সচেষ্ট। কারণ কর্মজীবনে উন্নতির জন্য স্ত্রীর ভূমিকাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে আনন্দময়ীর উপর খুব একটা জোড় খাটাতে সে সফল না। আনন্দময়ী নিজধর্ম সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বেশি পছন্দ করে। তাই সে শেমিজ পরে, জুতো পায়ে মেমসাহেব সেজে বেড়ানোর প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছে। তখনই কৃষ্ণদয়াল তাঁর স্ত্রীর আচার সংস্কারের প্রতি আক্রমণ করে বসেছে — 'সাহেব-সুবোকে যে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে, তোমার হিঁদুয়ানির জন্য তার উপায় নেই। এখন দেখছি চাকরির উন্নতির আশা তো নেই-ই, এবারে চাকরিটা না যায়।'[৭] এই পারিবারিক বাক্ বিতর্কের মাঝে নিজের ঢাক

নিজেই পিটিয়েছেন কৃষ্ণদয়াল মুখুজ্জে — 'আমি ওদের সঙ্গে ব'সে খানা খাই, বগি হাঁকিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াই, বাড়িতে খৃষ্টান দাসী রাখি এসব জানবার পর থেকে অল্প ক'মাসের মধ্যে আমার দুটো 'লিফট' মানে দুবার উন্নতি হয়েছে।'[৮] নিজ বাড়ির খ্রিষ্টান পরিচারিকা থেকে নিজ স্ত্রীকে উন্নতির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে উদগ্রীব কোম্পানির চাকুরে কৃষ্ণদয়াল। তাই সিপাহি বিদ্রোহের উত্তাপময় পরিস্থিতিতে এটোয়াতে নয় সংখ্যক নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি বিদ্রোহ করলে সমস্ত হতাশার মেঘ গ্রাস করে কৃষ্ণদয়ালকে। কারণ — 'আরে বাঙালীদের ওরা ছোট সাহেব মনে করে, খুব বলবে।'[৯]

বস্তুত একটি বাক্যে গল্পকার প্রমথনাথ বিশী কার্যত উনিশ শতকের সিপাহি বিদ্রোহে প্রবাসী বাঙালিদের অবস্থানকে পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। উনিশ শতকের বাঙালিরা কোম্পানির শাসন ক্ষমতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রবাসী বাঙালিদের প্রতিনিধী কৃষ্ণদয়াল একদিকে যেমন শ্রেণি সচেতন, অন্যদিকে আবার প্রবলভাবে ভীতু। তাই পরক্ষণেই কৃষ্ণদয়াল তাঁর স্ত্রী আনন্দময়ীকে শেমিজ খুলতে বলেছে। কারণ—'গাওয়ার সিপাহী শেমিজ দেখলে ক্ষেপে উঠতে পারে।'[১০]

বাড়ির দাসী লছমিয়ার মুখে দানিয়ে সাহেবের হত্যার সংবাদ, হিউম সাহেব ও গোরালোগ, বিবিলোগদের পলাইন বৃত্তান্ত শোনে কৃষ্ণদয়াল মুখুজ্জে। যার শেষ পরিণতি হল কোম্পানির মুল্লুক খতম ও দিল্লীর বাদশার শাসনের শুরু। তবে এরই মাঝে ঘরের বাইরে শোনা যায় অস্ফুট আর্তনাদ। স্বাভাবিক ভাবেই এই আর্তনাদের কারণ অনুসন্ধানের ফলে আইরিশ মহিলা ও তার শিশু পুত্র সন্তানের করুণ ভাগ্য পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয়। মহিলার স্বামী আইরিশম্যান পাদ্রী। শিকোয়াবাদের বাসিন্দা তাঁরা। শিকোয়াবাদে সিপাহি বিদ্রোহ হলে এটোয়া শহরে পালিয়ে আসে কোনোক্রমে। কিন্তু বিকেলবেলায় সিপাহিদের হাতে পাদ্রী স্বামী নিহত হলে ঐ মহিলা ছেলেটি সঙ্গে নিয়ে আনন্দময়ীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। নিঃসন্তান আনন্দময়ীর হৃদয়ে বাৎসল্য রস উঁকি দিলেও কৃষ্ণদয়াল কিন্তু চরম বাস্তববাদী পুরুষ। তাই আশ্রয়প্রার্থী মহিলাটি মারা গিয়েছে শুনে কৃষ্ণদয়ালের বক্তব্য : 'যাক, একটা আপদ তো চুকলো। ভগবান!'[১১]। এই ঘটনায় কৃষ্ণদয়ালের বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে উঠে আসে ব্যক্তিস্বার্থের নিষ্ঠুরতম উদাহরণ। ভগবান তথা ঈশ্বরের নাম নিতে দেখা গিয়েছে কৃষ্ণদয়ালকে। তবে কৃষ্ণদয়ালের 'ভগবান' ব্যক্তিস্বার্থ পরিসরে সীমাবদ্ধ। কৃষ্ণদয়ালের ব্যক্তিগত অভিধানে 'মানবিকতা' বলে কোনো শব্দের স্থান নেই। সে তাঁর ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য খৃষ্টান লছমিকে দাসী রূপে রাখতে পারে, আবার আশ্রয়প্রার্থী বিপদগ্রস্ত খ্রিষ্টান মহিলাকে 'আপদ' বলে চিহ্নিত করতে সিদ্ধহস্ত। গিরগিটির মতো রঙ বদলাতে সক্ষম কৃষ্ণদয়াল

মূলত শ্রেণি সচেতন কর্মচারী। যে চাকুরিবৃত্তির জন্য গর্ব করে, আবার চাকুরি বৃত্তির জন্যই সংকটগ্রস্ত হয়। সিপাহি বিদ্রোহে দেশ দশের সমূহ পরিবর্তনকে বুঝতে চেয়েছে সে ব্যক্তিস্বার্থের প্রেক্ষিতে। প্রবাসী বাঙালি কৃষ্ণদয়াল সিপাহি বিদ্রোহের জন্য বেশ বিচলিত এবং অসহায়।

পরবর্তীতে আনন্দময়ী ও লছমিয়া ঐ মৃত আইরিশ মহিলাকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু সদ্য অনাথ হয়ে যাওয়া শিশুটির জন্য কৃষ্ণদয়ালের কোনোরূপ সহমর্মিতা লক্ষ করি না। বরং সে খানিকটা বিব্রত হয়েছে অনাথ শিশুটিকে নিয়ে। অন্যদিকে সিপাহি বিদ্রোহের উত্তাপময় পরিস্থিতিতে আনন্দময়ীর স্থিতধী ভূমিকা পাঠকের নজড় কাড়ে। তাই ফিরিঙ্গি মেয়ের আশ্রয়ের খোঁজে আসা সিপাহিরা কৃষ্ণদয়াল মুখুজ্জের বাড়িতে তল্লাসী চালালে আনন্দময়ীর বাক্‌পটুতা এবং ব্যক্তিত্ব পাঠককে মুগ্ধ করেছে। সিপাহিরা শেষমেশ ফিরিঙ্গি মহিলার অনুসন্ধান না পেয়ে ফিরে যাওয়ার পর উদগ্রীব কৃষ্ণদয়ালের উক্তি — 'ছেলেটাকে কি করলে ? নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছ নাকি ?'[১২] গল্পের শুরুতে আমরা জানতে পারি কৃষ্ণদয়ালের প্রথম স্ত্রী পুত্রসন্তান প্রসব করে মারা যায়। কৃষ্ণদয়ালের সমস্ত রাগ নিজ পুত্র সন্তানের উপর পরায় ছেলেটিকে শ্বশুর বাড়িতে রেখে আসে। নিজ সন্তান কিংবা অপরের সন্তান, কোনোভাবেই কৃষ্ণদয়ালের প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন হয়নি। অপরিবর্তিত কৃষ্ণদয়াল বরাবরই আত্মকেন্দ্রিক ভাবনায় পুষ্ট। কৃষ্ণদয়াল মুখুজ্জের মতো বাঙালি বাবুদের চরিত্রগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উভয় দিকটি ফুটে উঠেছে সিপাহিদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে — 'কৃষ্ণদয়ালের দিকে তাকাইয়া যাহা বলিল, তাহার মর্মার্থ হইতেছে — যদিচ বাঙালীবাবুরা আচার বিচার মানে না, খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না, তাহাদের এরকম খৃষ্টান বলিলেই হয়, তবু ঠাকুরঘরে ফিরিঙ্গিকে স্থান দিবে ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য।'[১৩]

তবে ঘটনাক্রম তথা পরিস্থিতি পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণদয়ালের প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন হতে দেখা গিয়েছে। সিপাহিদের দখলীকৃত এটোয়া শহর কোম্পানি পুণরায় দখল করলে, প্রভুভক্ত এই কৃষ্ণদয়ালকেই দেখি ভগবদভক্তির থেকে হিউম সাহেবের প্রতি সে বেশি আস্থাভাজন। সেখানেই তার পরম বিশ্বাস বা চিরকালীন আশ্রয়। নিঃসন্তান স্ত্রী আনন্দময়ীর সেই শিশুটির প্রতি বাৎসল্য রসের প্রকাশকে কৃষ্ণদয়াল একপ্রকার তীব্র কটাক্ষ করেছেন। শিশুটিকে পাদ্রীদের হস্তগত করতে অভিমত প্রকাশ করে সে। তবে আনন্দময়ী শিশুটিকে লালন পালন করতে চাই। বস্তুত, এই ঘটনায় বাঙালি চাকুরিজীবী কৃষ্ণদয়ালের ভূমিকা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। যদিও সে একজন সন্তানের পিতা!

কৃষ্ণদয়ালের মনোভাবকে বুঝতে আমরা তাঁর দেশ কালের দিকে আলোকপাত করতে পারি। গল্পের প্রেক্ষাপট উনিশ শতকের সিপাহি বিদ্রোহ। প্রবাসী বাঙালি পরিবারের প্রধান পুরুষ কৃষ্ণদয়াল কর্মসূত্রে কোম্পানির কমিশারিয়েটের হেড ক্লার্ক। আমাদের স্মরণে থাকবে এই সিপাহি বিদ্রোহের আতুড়ঘর বহরমপুর, ব্যারাকপুর তথা বাংলা। পরবর্তীতে উত্তর ও মধ্য ভারতে এই বিদ্রোহ ব্যাপকতা লাভ করেছিল। কিন্তু ক্রমশই বাঙালিদের যোগাযোগ ও অন্তর্ভুক্তি লক্ষণীয়ভাবে কমতে থাকে সিপাহি বিদ্রোহের সঙ্গে। বিশেষত শিক্ষিত চাকুরিজীবী প্রবাসী বাঙালি, সিপাহিদের এই বিদ্রোহকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। কর্মসূত্রে কোম্পানির কর্মচারি তাঁরা। ভক্তির প্রতিদান দিতে গিয়ে সিপাহিদের কাছে সমগ্র বাঙালি জাতি কার্যত বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিল। তাই বিদ্রোহের উত্তাপময় পরিস্থিতিতে বাঙালির আত্মসংকট ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহকালে জাতীয়তাবাদের কোনোরূপ লক্ষণ তৎকালীন বাঙালিদের মধ্যে দেখা যায়নি বরং শ্রেণিস্বার্থ সম্পন্ন চাকুরিজীবী বাঙালি ব্যক্তিস্বার্থের দিকে ঝুঁকেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙালিদেরকে নিয়ে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন উভয় দিক থেকেই বিদ্যমান ছিল। শুধুমাত্র সিপাহিদের পক্ষ থেকে অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠেনি, কোম্পানির পক্ষ থেকে বাঙালিদের ভূমিকা আতসকাচে খতিয়ে দেখা হয়েছিল। বস্তুত, এরূপ প্রেক্ষাপটে প্রমথনাথ বিশীর লেখা আরও একটি গল্প ‘ছিন্নদলিল’। যেখানে প্রবাসী বাঙালিদের বিদ্রোহকালীন জীবন সংকট রূপায়িত হয়েছে।

তিন.

জেনারেল হ্যাভলকের সৈন্যরা কানপুর দখলের পরবর্তীতে সেখানকার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ শেরার উপর কানপুরের দায়িত্ব বর্তায়। কোটওয়ালীর উত্তর দিকে একটি বড় বাড়িটিকে সরকারের কাজের জন্য অধিকার করতে গিয়ে মিঃ শেরার আবিষ্কার করে ঐ বাড়িতে অবস্থিত একদল বাঙালিকে। কোম্পানির অনুপস্থিতিতে সিপাহিদের অত্যাচারে প্রবাসী বাঙালিদের করুণ অবস্থার সুনিপুণ বর্ণনা শোনা যায় বদ্যিনাথ মুখার্জ্জির মুখে। আলোচনা প্রসঙ্গে এই বদ্যিনাথের পরিচয়টি জেনে নেওয়া আবশ্যক : ‘ইওর অনার হাম বদ্যিনাথ মুখার্জ্জি কোম্পানীকা নোকর ফর থ্রি জেনারেশন। মাই গ্রান্ডফাদার কোম্পানীকা নোকর।’[১৪] আত্মপরিচয়ের সূত্রে বদ্যিনাথ মুখার্জ্জির রাজনৈতিক অভিমতটি ভীষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মিঃ শেরার কাছে এবং একই সঙ্গে গল্প পাঠকের কাছে। গল্পের কাহিনি যত এগোবে ততই বদ্যিনাথের বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবো আমরা। তবে গল্পের সূত্রধর হিসেবে

লেখক সংক্ষেপে গুটিকতক প্রবাসী বাঙালির অতিত বর্তমানকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন: 'এই কয়জন রাজভক্ত বঙ্গসন্তান বহুদিনের প্রবাসী। সকলেই কোম্পানীর চাকুরে। সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিবার আগে তাহারা আগ্রা, মিরাট, সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে চাকুরী করিত। খোদ বদ্যিনাথ কানপুরের কাছে সরকারের তহশীলদারী করিত। এমন সময়ে শ্যালক সিপাহী লোকেরা ক্ষেপিয়া ওঠে। এই সব বাঙ্গালী রাজভক্ত কাজেই অনেক নিগ্রহ সহিতে বাধ্য হয় এবং দুঃখকষ্ট অতিক্রম করিয়া কানপুর শহরে আসিয়া লয়।'[১৫]

বাঙালিদের মুখের বুলিতে মিঃ শেরার আশ্বস্ত হতে না দেখে বদ্যিনাথ একটি দরখাস্ত বার করে, যা রাজভক্তির প্রামান্য দলিল। যাহাতে লেখা– 'It is well known, your Excellency's Lordship that we, the Bengalees cowardly people.'[১৬] উদ্ধৃত ইংরেজি বাক্যে লেখক প্রমথনাথ বিশী সিপাহি বিদ্রোহের উত্তাপময় দিনগুলিতে সমগ্র দেশের প্রেক্ষিতে বাঙালির স্থান নির্দেশ করেছেন। অপ্রিয় হলেও একথা সত্য শিক্ষিত বাঙালি সিপাহি বিদ্রোহ থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে চলেছিল। ইংরেজ শাসনের প্রথম ক্ষেত্রভূমি ছিল এই বাংলা। ইংরেজদের আবির্ভাবে বাঙালি সমাজে বেশ কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বংশ কৌলিন্য এবং শাসন ক্ষমতার পরিবর্তে ক্রমশ বিত্ত কৌলিন্যের প্রতি বাঙালি আগ্রহ প্রকাশ করে। আর এই পরিবর্তনটি সাধিত হওয়ার পিছনে ইংরেজদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কারণ ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থেকে বাঙালির বিত্তশালী হওয়ার স্বপ্ন সযত্নে লালিত ও পালিত হয়েছিল সমগ্র উনিশ শতকে। তাই গোটা ভারতবর্ষে অন্যান্যদের থেকে বাঙালি কার্যত স্বতন্ত্র মনোভাব প্রকাশ করবে এটাই স্বাভাবিক। বাঙালি কিভাবে কোম্পানি শাসনের প্রারম্ভ কাল থেকে সঙ্গ দিয়ে আসছে, তার ইঙ্গিত প্রবাসী বাঙালি বদ্যিনাথ মুখার্জ্জির বক্তব্যে স্পষ্ট : 'আমরা ছিলাম কমিসারিয়েটে। আমরা বাঙ্গালীরা ঐ কাজটা ভাল পারি। হুজুর আমার গ্র্যান্ড ফাদার তেসরা মারাঠা যুদ্ধে ঐ কাজ করেছেন, আমার ফাদার বরাবর ঐ কাজে ছিলেন, বংশধারার দাবীতে আমিও ঐ বিভাগে কাজ পেয়েছিলাম।'[১৭] এখানেই শেষ নয়, বাঙালি বদ্যিনাথ নিজেদেরকে ছাপোষা মানুষ বলে অভিহিত করেছে। তবে বিদ্রোহের উত্তাপময় পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার তাগিদে বদ্যিনাথ লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে লেখা দরখাস্তখানি সুকৌশলে ব্যবহার করতে আগ্রহী। যুদ্ধ বা বিদ্রোহের পরিসর থেকে সরে এসে কানপুরে স্থিত বদ্যিনাথকে কার্যত নিজ স্বরূপ বর্ণনা করতে দেখা যায় : 'হুজুর ভীরু লোকে কখনো বিদ্রোহী হয় না, কারণ ভীরুতা হচ্ছে রাজভক্তির বীজ।'[১৮]

বদ্যিনাথের অভাবনীয় চাটুকারিতায় মিঃ শেরার অভিভূত হয়। তবে বাস্তববাদী এবং দূরদর্শী বদ্যিনাথ মিঃ শেরার প্রশংসাসূচক বাক্যকে লিখে নিতে তৎপর হয় — 'This house belongs to one Mokarjea, very loyal subject, please not to molest.'[১৯] মুখার্জ্জির আত্মরক্ষার তাগিদ ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে গিয়ে তাই শেরার ভাবনায় 'আশ্চর্য এই বাঙালী জাতটা।' তবে আপাত একমুখী গল্পে বাঁকবদল ঘটে সন্ধ্যাকালে ঐ বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী এক যুবকের প্রবেশে। কাশীধাম নিবাসী শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রবাসী বাঙালি ব্রাহ্মণ। এই আশ্রয়প্রার্থী তারকচন্দ্র রায় দাবি করে সিপাহিদের দ্বারা সে সর্বশান্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁকে সিপাহিদের গুপ্তচর সন্দেহে কেউ জায়গা দিতে রাজি নয় বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও। ঐ বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে যুবক তারকচন্দ্রকে আশ্রয় দেয় বদ্দিনাথ মুখার্জ্জি।

যুবক তারকচন্দ্র যুদ্ধ পরবর্তী পরিবেশ পরিস্থিতিতে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নারীর কণ্ঠে শোনা আর্তনাদের উৎস সন্ধানে আগ্রহ প্রকাশ করে। যদিও সে প্রবাসী বাঙালি। ঐ বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের আপত্তি ও প্রশ্নবাণের মধ্যেই তারকচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব পাঠকের নজর কাড়ে। প্রসঙ্গত, বাড়ির দেওয়ালে স্থিত দলিলকৃত দরখাস্তখানি দেখে তাই তারকচন্দ্র হতবাক হয়ে যায়। বাঙালি জাতি সম্পর্কে এ হেন শংসাপত্র! এরই মাঝে বদ্যিনাথ মুখার্জ্জির ডাক পড়ে কোটওয়ালীতে। যেখানে শেরার সাহেব বদ্যিনাথের কাছে জানতে চায় বাঙালি ছোকরা তথা সিপাহিদের চরকে আশ্রয় দিয়েছে কি না? সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বদ্দিনাথ। মিঃ শেরার বিশ্বস্ত বাঙালি বদ্যিনাথের সমস্ত কথা সত্যি বলে মনে করে। কারণ 'মুখার্জ্জি রাজভক্ত প্রজা'। যে রাজভক্তির উৎস ভীরুতা। ঘটনার পর দিন ভোরবেলা তারকচন্দ্রের আর দেখা মেলে না। কিন্তু দরজায় শেরার সাহেবের পরোয়ানার পরিবর্তে যে কাগজটি পাওয়া যায়, তাতে লেখা — 'this house belongs to traitors to the country' — Nana Sahib.'[২০] বস্তুত বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ বাড়িটিতে স্থিত বাঙালিদের উদ্দেশ্যে লেখা, তা বলায় বাহুল্য।

সিপাহি বিদ্রোহের ক্রান্তিলগ্নে বাঙালিদের যে ছবিটি তিল তিল গড়ে উঠেছিল, বাঙালি তারকচন্দ্র রায়ের প্রতিবাদ এক লহমায় তাকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। বাঙালির রাজভক্তি আদতে সমগ্র দেশের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য। লেখক সুকৌশলে স্বজাতির প্রতি প্রশ্ন তুলতে বাঙালি যুবক তারকচন্দ্র রায়কেই বেছে নিয়েছিলেন। সৃষ্টিশীলতার এক চরম নিদর্শন 'ছিন্নদলিল' কার্যত প্রবাসী চাকুরিজীবী বাঙালির

আত্মসমীক্ষার গল্প। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সিপাহি বিদ্রোহে বাঙালির ভূমিকা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদানে সমালোচকেরা চাকুরিজীবী প্রবাসী বাঙালিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন — 'এখন বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের যে অংশ প্রধানতঃ ইংরেজ সরকারের চাকুরিয়া ছিলেন, বিশেষ করে যাঁরা বাংলার বাইরে কাজ করতেন তাঁদের কথা বলব। এঁরা ইংরেজের সহকারী হয়ে বৈষয়িক দিক থেকে খুবই লাভবান হয়েছিলেন, কাজেই এঁদের একটি বড় অংশ একেবারেই 'খয়ের খাঁ' শ্রেণীতে পরিণত হন।'[২১] যার প্রতিনিধী স্বরূপ 'সেই শিশুটি' গল্পে কৃষ্ণদয়াল এবং 'ছিন্নদলিল' গল্পে বদ্যিনাথ মুখার্জ্জিকে দেখি। বিচ্ছিন্ন ব-দ্বীপের মতো প্রবাসী চাকুরিজীবী বাঙালি সমাজ মহাবিদ্রোহের অভ্যুত্থান থেকে মুখ ফিরিয়েছিল, শুধুমাত্র শ্রেণিস্বার্থের জন্য।

চার.

সিপাহি বিদ্রোহের চরিত্রগত দিক নিয়ে নানা প্রশ্ন বিদ্যমান ছিল এবং থাকবে। সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী অমৃত সঞ্চয় (১৯৬২) উপন্যাসের নিবেদন অংশে সিপাহি বিদ্রোহে বাঙালির অন্তর্ভুক্তি হওয়া বা না হওয়া নিয়ে কার্যত তিনি দার্শনিক : '১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানে বাঙালীদের কোন ভূমিকা কেন ছিল না এ নিয়ে মতান্তর রয়েছে, তবে কারণ যা-ই হোক না, এ কথা বুঝতে অসুবিধে নেই যে, সেদিন বাঙালী সেই বিদ্রোহের অংশীদার হলেও ইংরেজ শাসনের অকস্মাৎ অবসান ঘটতে পেত না এবং পরবর্তীকালে শিক্ষায়, শিল্পে, জ্ঞানে, সাহিত্যে এবং সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত জাতীয় আন্দোলনের অপ্রতিবন্ধ ক্ষেত্ররূপে বাংলার বলান্বিত আত্মপ্রকাশ ভারতের ইতিহাসকে এমন জটিল, বিচিত্র ও অমোঘ করে তুলতে পারত না।'[২২] বস্তুতঃ সাহিত্য সম্ভাব্যময়তার ক্ষেত্রভূমিতে নিরন্তর বিস্তার লাভ করে। লেখক প্রমথনাথ বিশী 'চাপাটি ও পদ্ম' নামক গল্পগ্রন্থে এই সম্ভাব্যময়তাকে পুঁজি করে সিপাহি বিদ্রোহের নানা মুহুর্তকে ছুঁয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্রোহকালীন পরিবেশে প্রবাসী বাঙালিদের চাকুরিজীবী মানসিকতা, আত্মসংকট, উপলব্ধি সর্বোপরি কোম্পানি ও সিপাহিদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের নানা মাত্রাগুলি রূপ পেয়েছে 'সেই শিশুটি' এবং 'ছিন্ন দলিল' গল্পে। কৃষ্ণদয়াল এবং বদ্যিনাথ মুখার্জ্জির মানসিকতা, কর্মপন্থা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, আত্মরক্ষার তাগিদ আজকের দিনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। 'চাকুরে মনোবৃত্তি' উনিশ শতকে বাঙালি জীবনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, বর্তমানে তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বাঙালি আজও নিজেকে চাকুরিজীবী বলতে গিয়ে শ্লাঘাবোধ করে। শুধু বাঙালি না, ভারতবর্ষের শিক্ষিত নাগরিকরা চাকুরিবৃত্তির স্বপ্ন নিয়ে লালিত পালিত হয়

আজও। সিপাহি বিদ্রোহকালীন প্রবাসী বাঙালি চাকুরিজীবীর জীবনচর্যার নানান অভিঘাতের সঙ্গে পাঠক সহজেই একাত্মতা অনুভব করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কৃষ্ণদয়াল, বদ্যিনাথদের সমূহ সংস্করণ স্বাধীন ভারতীয় সমাজে আজও প্রবলভাবে বিদ্যমান।

পাঁচ.

তবে বাঙালি হওয়ার স্বার্থে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে বাঙালির কাপুরুষ সুলভ, আত্মরতিপ্রিয় স্বভাবগুণের অন্তঃস্থলে কোথাও কি বীরত্বের চিহ্নমাত্র নেই? — আজীবন কি বাঙালি চাটুকারিতায় যুক্ত? সর্বোপরি উনিশ শতকের বাঙালি এত চর্চিত কেন? এসকল প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে আমাদের একটু পিছনে ফিরে তাকাতে হয়। যে সময়ে ব্রিটিশ শাসকের তত্ত্বাবধানে কল্পনামূলক ইতিহাস নির্মাণের চাহিদা ছিল বিপুল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন এই কর্মযজ্ঞের সক্রিয় কর্মী। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনের পাতায় বাংলার ইতিহাস নির্মাণ প্রসঙ্গে বাঙালির গুণাবলী নিয়ে বেশ সরব — 'সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীসুলভ, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়'। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সমন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্ন দেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্ন জাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস।[২৩] লক্ষণীয় যে উপরিউক্ত বক্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেকলের নাম উল্লেখ করেছিলেন। স্মরণীয় যে রাজসিংহ উপন্যাসের কাহিনি চয়নে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে জেমস টডের কল্পনামূলক ইতিহাসের দ্বারা বিশেষভাবে প্রবাভিত হতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে প্রমথনাথ বিশীর 'ছিন্নদলিল' গল্পে দেখি 'The Bengalees, are a cowardly people'। এ হেন বক্তব্যের প্রবক্তা চার্লস বল, প্রমথনাথ বিশী নন। চার্লস বল (Charles Ball) তাঁর History of India Mutiny Volume – I নামক গ্রন্থে বাঙালিকে কাপুরুষ বলে সম্মোধন করেছিলেন। সময়ের সঙ্গে সেই ভাবনাকেই আত্মস্থ করেছে সুশীল বাঙালি সমাজ, একই সঙ্গে লেখক প্রমথনাথ বিশী। আমরা যদি গভীরভাবে সাহেবদের ইতিহাস নির্মাণের দিকে আলোকপাত করি তাহলে দেখব জেমস টড থেকে মেকলে, চার্লস বল সকলেই নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে বেশ সচেতন। জেমস টড হিন্দু-মুসলমান বিরোধের তত্ত্ব নির্মাণ ও বর্ণনায় আগ্রহী। অনুরূপভাবে চালর্স সমগোত্রীয় সমস্ত পাশ্চাত্যের

ঐতিহাসিকেরা সিপাহি বিদ্রোহে ব্যর্থতার জন্য সাধারণ ভারতবাসীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কুসংস্কারকে দায়ী করেছিলেন। বিদ্রোহে ব্রিটিশ শাসকের সাফল্য কথা তুলে ধরতে বাঙালিদের ব্যবহার করেছে ব্রিটিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত। বাঙালির অবস্থান কার্যত শাখের করাত সমতুল্য সিপাহি বিদ্রোহ পর্বে। সিপাহি বিদ্রোহ পর্বে প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষ বাঙালির কর্ম ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করে, শেষ পর্যন্ত বাঙালিকে কাপুরুষ বলে ছেড়েছে ব্রিটিশ শাসক। বাস্তবে বাঙালির এই কাপুরুষ চরিত্রের সারবত্তা নিয়ে অনেক প্রশ্নই বিদ্যমান। আমরা দেখেছি উনিশ শতকে বাঙালিরা আমৃত্যু বিদ্রোহ করে গিয়েছিল শাসকের বিরুদ্ধে। ওয়াহাবি বিদ্রোহে বারাসাতের তিতুমীর, ফরাজি বিদ্রোহে দুদুমিঞা, নীল বিদ্রোহে বিশ্বনাথ সর্দার, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিরা সকলেই ছিলেন বীর বাঙালি। উনিশ শতকের ওয়াহাবি বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহে বাঙালিদের আত্মত্যাগ বীর ধর্মেরই প্রতীক। তাই শুধুমাত্র সিপাহি বিদ্রোহকে সামনে রেখে বাঙালিকে কাপুরুষ বলে সংজ্ঞায়িত করা সমীচীন নয়। সাহেব শুভদের মেধা প্রসূত ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে বাঙালির প্রতি মূল্যায়ণ না করায় ভালো। তাতে নিজেদেরকেই ঠকতে হয়।

প্রসঙ্গত 'চাপাটি ও পদ্ম' গ্রন্থের 'সেই শিশুটি' এবং 'ছিন্নদলিল' গল্পে সিপাহি বিদ্রোহকালীন ও তার পরবর্তী সময়ে প্রবাসী বাঙালি বেশ অসহায়। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসনে সবচেয়ে প্রগতিশীল জাতি বাঙালি শাসন ক্ষমতা দখলের জটিল অঙ্কের মধ্যে পড়ে পরাভূত, বিপর্যস্ত, ভীত, সন্ত্রস্ত। রাজভক্তিকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণদয়াল, বদ্যিনাথরা আত্মরক্ষার তাগিদে ব্রিটিশ নির্ভরতাকে বেছে নিয়েছে। উত্তর ও মধ্য ভারতে চাকুরি সূত্রে স্থিত বাঙালিরা সিপাহি বিদ্রোহের মিছিলে পা মেলাতে পারেনি। তবে ব্রিটিশ শাসকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে সচেষ্ট প্রবাসী বাঙালির আত্মসংকটগ্রস্ত চিত্রটি লেখক প্রমথনাথ বিশীর কাছে মূল প্রতিবাদ্য বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বজাতির ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী আবিষ্কার করেছিলেন বাঙালির দোদুল্যমান পরিস্থিতিকে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলাকালীন উলুখড়ের বনে যে বিপর্যয় চলেছিল, সেখানে বাঙালি চরম বিপর্যয় প্রবলভাবে বিদ্যমান। ব্রিটিশ শাসক কিংবা সিপাহিদের রোষানলের থেকে বাঙালি কৃষ্ণদয়াল, বদ্যিনাথদের আত্মরক্ষার তাগিদটি বেশ অভিনব। চাকুরিজীবী সত্ত্বায় মোহগ্রস্ত বাঙালি সিপাহি বিদ্রোহ পর্বে প্রবলভাবে আত্মকেন্দ্রিক। তাই জাতীয়তাবোধ কিংবা বিদ্রোহী চেতনা বাঙালিকে নাড়া দেয় না, তার প্রবাস জীবনে।

তথ্যসূত্র:

1. বন্দ্যোপাধ্যায়, আলাপন, *আমলার মন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০২১, পৃষ্ঠা. ৬২

2. বিশী, প্রমথনাথ, *লালকেল্লা*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৬, ভূমিকা অংশ

3. বিশী, শ্রী প্রমথনাথ, *চাপাটি ও পদ্ম*, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬২, পূর্বকথা অংশ

4. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪

5. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩

6. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪

7. ঐ, পৃষ্ঠা. ২

8. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩

9. ঐ, পৃষ্ঠা. ৬

10. ঐ, পৃষ্ঠা. ৭

11. ঐ, পৃষ্ঠা. ১২

12. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৫

13. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৪

14. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৬

15. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৭

16. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৮

17. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৯

18. ঐ, পৃষ্ঠা. ৫০

19. ঐ, পৃষ্ঠা. ৫১

20. ঐ, পৃষ্ঠা. ৬০

21. মিত্র, সুকুমার, *১৮৫৭ ও বাংলাদেশ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, পৃষ্ঠা. ২০

22. দেবী, মহাশ্বেতা, *অমৃত সঞ্চয়*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, নিবেদন অংশ

23. *বঙ্কিম রচনাবলী* (২য় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১১, পৃষ্ঠা. ২৮৮